গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

‘‘জীবনে মর্যাদা পাওয়া এক কথা; আর ভাল খাবার, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, শাড়ি-গাড়ি পাওয়া আর এক কথা। এই দুইয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। আপনাদের বুঝতে হবে, মর্যাদা হারিয়ে কোনও কিছু পাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। খাওয়া-পরা, সুখ-সম্পদ, যৌন জীবন, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি-মমতা, সবই মানুষের জীবনে দরকার। কিন্তু মর্যাদা হারিয়ে যিনি এগুলো পেলেন, মানুষ হিসাবে তাঁর আর রইল কী?’’

—নারীমুক্তি প্রসঙ্গে

বিশ্ববাজারে তেল অত্যন্ত সস্তা
মুনাফার স্বার্থেই দেশে দাম চড়িয়ে রেখেছে সরকার

আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম নামতে নামতে এখন ব্যারেল পিছু ৮০ ডলারের আশেপাশে। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতে এক সময়ে ব্যারেলে তা ১৩৯ ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। দাম ১০০ ডলার ছাড়াতেই দেশের বাজারে জ্বালানির দাম তর তর করে বাড়তে শুরু করেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের মানুষের আশা ছিল, এখন যখন দাম প্রায় ৬০ ডলার কমে গেছে তখন সরকার দেশের বাজারেও সেই অনুপাতে তেলের দাম কমাবে। কিন্তু মানুষ দেখছে মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে তেলের দাম আকাশছোঁয়াই থেকে গেছে। জনগণ দাম কমার কোনও সুবিধাই পাচ্ছে না।

তা হলে এই দাম কমার সুবিধাটা পাচ্ছে কারা? অনেকেরই মনে আছে লকডাউনের শুরুতে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম শূন্যে নেমে গিয়েছিল তখনও দেশের বাজারে বিজেপি সরকার তেলের দাম এতটুকুও কমায়নি, আকাশছোঁয়া ট্যাক্স চাপিয়ে দাম একই রেখে দিয়েছিল। আর এখন দাম কমার সুবিধের পুরোটাই ব্যবহার করে সরকারি এবং বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলির লুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সরকার। যদিও সরকার এতেই ক্ষান্ত হয়নি। আরও অবিশ্বাস্য লুটের ব্যবস্থা করেছে তারা যা অনেকেরই জানা নেই।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে আমেরিকা এবং ইউরোপের ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার তেলের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে। ফলে রাশিয়ার তেলের বাজার অনেকখানিই সঙ্কুচিত হয়েছে। এই অবস্থায় এশিয়ার দেশগুলিতে তেল বিক্রির চেষ্টা করছে রাশিয়া। বিজেপি সরকার যেহেতু এই যুদ্ধের বিরোধিতা না করে রাশিয়ার পক্ষ নিয়েছে, সেই সুবাদে তারা ভারতকে জলের দামে তেল বেচছে। ফলে ভারতের তেল কোম্পানিগুলি আগে ইরাক, ইরাণ, সৌদি আরব থেকে যে তেল কিনত তা প্রায় বন্ধ করে দিয়ে সিংহভাগ তেল এখন রাশিয়া থেকেই কিনছে।

সরকারি এবং বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলি কত দামে তেল কিনছে রাশিয়া থেকে ভারতের ‘গণতান্ত্রিক সরকার’ তা কিন্তু দেশের মানুষের সামনে কিছুতেই আনতে রাজি নয়। তবে এটুকু জানা আছে যে, শুরুতে যখন রাশিয়া ৪০ ডলারে তেল বেচছিল তখনই ঘোষণা করেছিল প্রয়োজনে আরও কম দামে তারা ভারতকে তেল দিতে রাজি আছে। সম্প্রতি জি-৭ ভুক্ত দেশগুলি নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এসেছে রাশিয়ার উপর। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের

সাতের পাতায় দেখুন

নির্ভয়া হত্যার দশ বছর
নারী সুরক্ষা কোথায় দাঁড়িয়ে

১৬ ডিসেম্বর এলেই মনে পড়ে সেই ভয়ঙ্কর দিনটির কথা। দশ বছর আগে ২০১২-এর এই দিনটিতে দিল্লিতে চলন্ত বাসে এক প্যারামেডিকেল ছাত্রীর ওপর পৈশাচিক অত্যাচারের ঘটনায় শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। তেরো দিন মর্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করার পর মৃত্যু হয় মেয়েটির। ততদিনে দেশ তাকে চিনেছে ‘নির্ভয়া’ নামে। ক্ষেপে উঠেছিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে ১৬ ডিসেম্বর ‘নির্ভয়া দিবস’ উপলক্ষে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা। বক্তা ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সূর্য বিকাশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অভিজিৎ রায়, অধ্যাপিকা সরিফা খাতুন, অধ্যাপক ঋতম মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক অশোক সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত।

মৈপীঠ ঃ তৃণমূলী গণতন্ত্রের নমুনা
জনসভা করতেও হাইকোর্টে মামলা করতে হয়

কেমন গণতন্ত্র চলছে পশ্চিমবঙ্গে, তার নমুনা পাওয়া গেল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠে। সেখানে সামান্য একটা গ্রামীণ জনসভা করার জন্য অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে স্থানীয় থানা। দু-মাস ধরে দলের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে বারবার আবেদন করলেও স্থানীয় থানা তা বারবার নাকচ করে দিয়েছে।

কেন থানা জনসভার অনুমতিটুকু দিচ্ছে না? রাজ্যের সর্বত্রই সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, থানাগুলি শাসক দলের অলিখিত পার্টি অফিসের শাখাতে পরিণত হয়েছে। মৈপীঠের কোস্টাল থানা ও কুলতলি থানার পুলিশও নিজেদের আচরণে তা প্রমাণ করে চলেছে।

এই মৈপীঠ চাষি আন্দোলন, মৎস্যজীবীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সমস্ত স্তরের গরিব খেটে খাওয়া মানুষের আন্দোলনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম। আন্দোলন করতে গিয়ে শুধু একটি পঞ্চায়েত এলাকাতেই শাসক দলের পোষা গুণ্ডা এবং পুলিশের আক্রমণে প্রাণ দিয়েছেন এস ইউ সি আই (সি) দলের বহু নেতা-কর্মী। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেস, তারপর সিপিএম বর্তমানে

সাতের পাতায় দেখুন

মৈপীঠের সভায় জন সমাবেশ। বক্তা ছিলেন কমরেডস তরুণ মণ্ডল, তরুণ নস্কর এবং জয়কৃষ্ণ হালদার

কমরেড অনীশ রায় স্মরণসভা

দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনীশ রায় স্মরণে ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সভা। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য (ছবিতে ভাষণরত), রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ও কমরেড কাঞ্চন দাশগুপ্ত

নারী সুরক্ষা কোথায় দাঁড়িয়ে

একের পাতার পর

গোটা দেশের মানুষ। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে অবরুদ্ধ হয়েছিল দিল্লির রাজপথ। প্রশাসন লাঠি-গ্যাস-জলকামান চালিয়েও সেই বিক্ষোভের আগুন নেভাতে পারেনি। দেশ জুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভ এবং আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত দোষীদের চরম শাস্তি সহ নারী সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সরকার।

আট বছর ধরে নানা দীর্ঘসূত্রতা, টালবাহানার পর অবশেষে ২০২০-র মার্চে নির্ভয়ার অপরাধীদের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়েছে। কিন্তু ঘটনার এত বছর পরেও আজ, এই ২০২২-এর ভারতবর্ষে কেমন আছেন দেশের মেয়েরা? সামান্যতম নিরাপত্তা তাঁরা পেয়েছেন কি? এতটুকুও কি বদলেছে দেশের, সমাজের পরিস্থিতি?

'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও' স্লোগান দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভোটে জিতে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। কিন্তু তথ্য-পরিসংখ্যান এবং মহিলাদের প্রতিদিনের আশঙ্কা-আতঙ্ক-চোখের জল বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশের বেটিরা সত্যিই বাঁচতে পারছেন কিনা, প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্র বা বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের বড় বড় নেতা-মন্ত্রীদের তা ভাবার সময় নেই। জনগণের ক্ষোভ স্তিমিত করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নারী সুরক্ষার ঢাকঢোল পিটিয়ে 'নির্ভয়া ফান্ড' তৈরি করেছিল। সেই ফান্ডের টাকা বয়ে গেছে অন্য খাতে, এমনকী মন্ত্রীদের গাড়ি কেনার কাজেও। নারী সুরক্ষার ব্যবস্থা না হোক, তা নিয়ে মিডিয়ার প্রচারে খরচ হয়ে গেছে কোটি কোটি টাকা।

সদ্য সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছে শ্রদ্ধা ওয়ালকর হত্যার ঘটনা। বাবা-মার অমতে যে প্রেমিকের হাত ধরে শ্রদ্ধা ঘর ছেড়েছিলেন, সেই মানুষটাই তাকে নৃশংস ভাবে খুন করে ভয়াবহ পৈশাচিকতায় ঠাণ্ডা মাথায় দেহ লোপাটের চেষ্টা করল। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ঝাড়খণ্ডের অঙ্কিতাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল এক যুবক। আবার বহরমপুরে এক ছাত্রীকে ভরসন্ধ্যায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হল। এছাড়া বধূ-নির্যাতন, পণ না পেয়ে হত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারীপাচার তো প্রতিদিনের ঘটনা। এর যেন বিরাম নেই, শেষ নেই। এ সমাজে যেন মেয়েদের মুক্তি নেই। প্রশ্ন জাগে, সমাজটা কেন কীভাবে এত বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে? নারীজঠর থেকে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ কী করে আর একজন নারীকে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করতে পারছে? এই সমাজ মানুষকে কেন অমানুষে পরিণত করছে?

যদিও এ সব ঘটনা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে দেশ জুড়ে নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের হয়েছে ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ২৭৮টি, যা আগের বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। এর বাইরেও অসংখ্য নির্যাতনের ঘটনা নানা কারণে নথিভুক্ত হয় না। গার্হস্থ্য হিংসায় যদি বাড়ির লোক, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে যদি প্রভাবশালী কেউ যুক্ত থাকেন, অনেক সময়ই অভিযোগ জানানোর সাহস হয় না নির্যাতিতার। যারা সাহস করে এগিয়েও আসেন, সুবিচারের জন্য শুরু হয় তাদের অনন্ত অপেক্ষা। আদালতে জমতে থাকে অভিযোগের পাহাড়। বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা অপরাধীদের সুবিধে করে দেয়। নেতা-মন্ত্রী-আমলা কিংবা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতার ছত্রছায়ায় থাকা দুষ্কৃতীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এ রাজ্যে হাঁসখালির ঘটনায় যেমন দেখা গেল, রাজ্যের শাসক দলের নেতার ছেলে জন্মদিনে নাবালিকা বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে গণধর্ষণ করল। তারপর বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে মেয়েটির পরিবারকে এমন ভয় দেখানো হল যে তারা থানায় অভিযোগ জানানো দূরের কথা, সময় মতো মেয়েটিকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে পারল না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হল মেয়েটির। উত্তরপ্রদেশের হাথরস বা জম্মুর কাঠুয়ায় শাসক দল বিজেপির নেতারা সরাসরি ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ালেন। অতি সম্প্রতি গুজরাটে বিলকিস বানোর ধর্ষকদের, তার শিশুকন্যার নৃশংস খুনিদের সাজার মেয়াদ কমিয়ে মুক্তি দেওয়া হল শুধু নয়, মুক্তি পাওয়ার পর তাদের মালা পরিয়ে মিষ্টি খাইয়ে বরণ করা হল বিজেপি অফিসে। দেশের উচ্চতম বিচারালয় পর্যন্ত এই জঘন্য অপরাধীদের শাস্তি মকুবের বিরুদ্ধে ওঠা পিটিশন খারিজ করে দিল। কোনও সভ্য দেশে এ জিনিস ভাবা যায়!

এসব ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের নেতারা নারীদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন শুধু বক্তৃতার মঞ্চে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ভোট টানা। বাস্তবে লাগাতার বেড়ে চলা নারী-নির্যাতন নিয়ে তাঁরা ছিটেফোঁটাও উদ্বিগ্ন নন। উল্টে বহু ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতা ঢাকতে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য তাঁরা মহিলাদেরই দায়ী করেন। নিদান দেন, নারীরা নির্যাতিত হয় কারণ তারা লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে বাড়ির বাইরে যায়। পুলিশ এবং প্রশাসনের আমলাদের ভূমিকাও একই। কোনও প্রশাসক নারী-সুরক্ষায় আন্তরিক হলে প্রথমেই তিনি এই সমস্ত ধর্ষক-খুনি-নির্যাতনকারীদের কঠোর সাজা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতেন, পথেঘাটে-কর্মস্থলে নারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। লিঙ্গসাম্যের প্রতিষ্ঠা, সমাজ মানসিকতায় গেড়ে বসে থাকা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত করা দূরের কথা, এই প্রাথমিক কাজটুকুও তো কেউ করছেন না!

নারীর উপর এই উৎপীড়নের মানসিকতার পিছনে আসলে রয়েছে তাদের পূর্ণ মানুষ না ভেবে শুধুই বংশবৃদ্ধির, শুধুই যৌনলালসা চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসাবে দেখা। সমাজে গেড়ে বসে থাকা এই মানসিকতার বীজ অনেক গভীরে। পুঁজিবাদের শুরুর দিনগুলোয় অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির সাথে সাথেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দাবি উঠেছিল। শিক্ষায় সম্পত্তিতে কর্মক্ষেত্রে নারীর সমমর্যাদা সমানাধিকারের দাবিও তার সাথে যুক্ত ছিল। দেশে দেশে শ্রমজীবী নারীসমাজ সেদিন নানা অধিকারের দাবিতে ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বহু বরেণ্য মনীষী। কিন্তু পুঁজিবাদ যেহেতু একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা এবং তার একমাত্র লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা, তাই যত দিন গেছে ক্রমে প্রগতিশীলতা হারিয়ে, শুরুর দিনের গণতন্ত্রের স্লোগান ছেড়ে সে স্বৈরতন্ত্রকে আশ্রয় করেছে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল মুমূর্ষু পুঁজিবাদ তাই মুখে ব্যক্তিস্বাধীনতার বুলি আওড়াতে আওড়াতেই ব্যক্তির যথার্থ স্বাধীনতাকে গলা টিপে হত্যা করছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা দূরে থাক, সাধারণ মানুষের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার স্বাধীনতাটুকুও এ সমাজে নেই। নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। নিরানব্বই শতাংশ মানুষের শ্রম লুঠ করে এক শতাংশ মালিকের মুনাফার পাহাড় বানানোর এই ব্যবস্থা কখনওই নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা, অধিকার দিতে পারে না। তাই চারপাশে তাকালে আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, বড় বড় দলগুলো মুখে যতই নারীমুক্তি নারীপ্রগতির কথা বলুক, বাস্তবে তাদের আচরণে কাজেকর্মে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন। একদিকে সমাজে নারীসুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত গাফিলতি, অবহেলা, অন্যদিকে বাজারি বিজ্ঞাপনে নারীদেহের অবাধ পণ্যায়ন।

নারীকে ভোগের বস্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবা, নারীর উপর কর্তৃত্ব করার যে মানসিকতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে, তা দূর করতে গেলে শুধু পুরুষতন্ত্র ঘা খাবে না, টান পড়বে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়াতেও। তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই পুঁজিবাদ চায়, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রসার ঘটুক। তাই এই সমাজে পুরুষকেও যেমন নারীকে মানুষ ভাবার বদলে 'মেয়েমানুষ' ভাবতে শেখানো হয়, নারীকেও পরিপূর্ণ মানুষের মর্যাদা নিয়ে বিকশিত হতে দেওয়া হয় না। সমাজের একটা বড় অংশের মেয়েকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পূর্ণ মানুষ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার বদলে হীনমন্যতা, নির্ভরশীলতা, পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে সাজপোশাকে কাজেকর্মে তাদের খুশি করার মানসিকতা নিয়েই বেড়ে উঠতে বাধ্য করা হয়। একদিনে এ পরিস্থিতি পাল্টাবে না। শুধুমাত্র কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সঠিক রাজনৈতিক দর্শনকে হাতিয়ার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা এবং উন্নত সংস্কৃতির আধারে তার পরিপূরক সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলাই দেশের মাটিতে নারীমুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, 'মানব সমাজে যতরকম শোষণ-অত্যাচার বলবৎ আছে, সেই সব রকম শোষণ-অত্যাচারের অবসান ঘটাতে হবে। এটাই হল আমাদের লক্ষ্য। নারীর উপর যে অন্যায়-জুলুম চলছে

তমলুকে মহিলাদের বিক্ষোভ। ১৬ ডিসেম্বর

তারও অবসান ঘটাতে হবে। আর এই কাজ আপনারা তখনই করতে পারবেন যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উৎপাদন যন্ত্রকে ব্যক্তি মালিকানা থেকে মুক্ত করতে পারবেন, তার আগে নয়। অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানার অবসানের পথেই যথাযথ নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা অর্জিত হবে। এই জন্য নারীদেরও বুঝতে হবে যে, যদি তারা সত্যি স্বাধীনতা চান, সমান মর্যাদা চান, তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য যে লড়াই সেই লড়াইতেও তাদের একইভাবে সামিল হতে হবে।' আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা যারা নারী জীবনের যন্ত্রণা-লাঞ্ছনার অবসান চাইছি, আমরা যারা যথার্থ অর্থে নারীমুক্তি চাইছি, তাদের এগোতে হবে এই পথেই।

দর্শন বলতে কী বুঝি

গত সংখ্যায় দর্শন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে সাধারণভাবে দর্শনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষ বিশেষ সত্যগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ যোগসূত্রটি খুঁজে বের করে তার ভিতর থেকে জগৎ সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে, সেই সামগ্রিক ধারণা, সেই সাধারণ সত্যের উপলব্ধিই হচ্ছে দর্শন। এর পরবর্তী আলোচনা প্রকাশ করা হল।

—সম্পাদক গণদাবী

(২)

আমরা দর্শনের সংজ্ঞা ঠিক করতে গিয়ে বলেছি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিনিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্ব (থিওরি) বা নিয়ম (ল) আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব এবং নিয়মগুলির মধ্য থেকে বস্তু জগতের সাধারণ (কমন) নিয়ম বা তত্ত্বগুলি খুঁজে বের করার কাজটি হচ্ছে দর্শনের এক্তিয়ারভুক্ত।

পদার্থবিদ্যা আমাদের কী দেখায়? এই দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ—তা সে ইট-কাঠ-লোহা-পাথর বা আলো-হাওয়া-জল-আগুন যাই হোক না কেন— এই সমস্ত জিনিসকে আমরা যেমনটি দেখেছি, ঠিক তেমনটি সামনে ধরে রেখে তাদের পদার্থগত রূপের বর্ণনা দেয়, শব্দ, আলো, তাপ চৌম্বক ও অপরাপর শক্তির চরিত্র এবং বস্তু জগতের গতির (মোশন) সন্ধান বাতলায় আর তাদের এই ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে একটাকে অন্যটা থেকে আলাদা করে চিনতে শেখায়।

পদার্থ বিজ্ঞানী যখন পদার্থের বাইরের চাল-চলন মেজাজ-মর্জির তত্ত্ব তালাশে ব্যস্ত, তখন রসায়ন শাস্ত্রী সেই সব পদার্থের অন্তরের মতিগতির হদিশ খুঁজে বেড়ান। সব খোঁজ খবর নেওয়া শেষ করে তিনি লিখতে বসেন রসায়ন শাস্ত্র— ছোটবড়, হাল্কা-ভারী, সব পদার্থের অন্তরের কথা; একের সঙ্গে অপরের বিরহ মিলনের অন্তহীন কাব্য কাহিনি। রসায়নের কারবার পদার্থ নিয়ে, মৌলিক পদার্থগুলোর কোনটা বা নিজের খেয়াল খুশিতে একা একাই ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা দল বেঁধে আর পাঁচটা ভিনজাতের মৌলের সঙ্গে জোট পাকিয়ে তৈরি করে নতুন পদার্থ—যৌগিক পদার্থ। আর সেই জোট বাঁধার উল্লাসে হারিয়ে ফেলে নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের পরিচয়। আর এই শতেক মৌলের শতেক কাহিনি রচনার মধ্য দিয়ে রসায়নশাস্ত্র তুলে ধরে বস্তু জগতের ভাঙাগড়ার আইন-কানুন, এক পদার্থ থেকে অপর পদার্থের আবির্ভাবের নিয়ম-নীতি।

জীব বিজ্ঞানের কাজ জন্তু-জানোয়ার, গাছ-পালা নিয়ে। জ্যান্ত মানুষ, জ্যান্ত প্রাণী, লতা-পাতা, গাছ-পালা ধরে কেটে-কুটে ছিঁড়ে-খুঁড়ে সবার ভিতরের প্রকৃতি বাইরের আকৃতি দেখে একের পর এক থাকের পর থাক সাজিয়ে রেখে জীব-বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারা, বুঝিয়ে দেয় কেমন করে সামান্য যৌগিক রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তনের পথে ক্রমশ নতুনতর, জটিলতর, উন্নততর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, কেমন করে আঠার মতো এককোষী প্রাণী অ্যামিবা থেকে ক্রমাগত বিকাশ ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই মানুষ জাতি এই দুনিয়ার বুকে জন্ম নিয়েছে, কেমন করে মানুষ তার চারপাশের পরবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ক্রমাগত নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টায় নিজের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে।

মনস্তত্ত্বের কর্মক্ষেত্র মানুষের মন। কেমন করে মস্তিষ্কের ক্রমাগত বিকাশের পথে সামান্য জান্তব প্রবৃত্তিগুলি, যুক্তি বিবেকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও উন্নততর হয়ে এসেছে, কেমন করে প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্তির এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের প্রবৃত্তিকে, নিজের স্বভাবকে, নিজের চরিত্রকে ক্রমাগত নিজের যুক্তিবোধ আর বিবেক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়ে উঠেছে, কেমন করে একদিন এই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পথেই মানুষের যুক্তিবোধ আর বিবেক বুদ্ধির সঙ্গে জৈব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ মিলন ঘটে এক নতুন মনের সৃষ্টি হবে, যখন মানুষকে আর তার বিবেক বুদ্ধিকে জোর করে প্রবৃত্তির ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না, যখন মানুষের জাগ্রত প্রবৃত্তিগুলিকে আর কড়া যুক্তির কঠোর শাসনে বেঁধে রাখার দরকার হবে না, যখন আদিম জান্তব প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হবে নতুন যুক্তি-সিদ্ধ প্রবৃত্তিতে, মনস্তত্ত্বের দর্পণে মনের এই ভূত-ভবিষ্যতে ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে মনের বিকাশের রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন।

সমাজনীতি শেখায় কী ভাবে আদিম বর্বর গোষ্ঠী সাম্যবাদী সমাজ চাহিদার তুলনায় যোগানের অভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল এবং কী ভাবে পরবর্তীকালে এই দ্বিধা বিভক্ত সমাজে শোষক-শাসক শ্রেণি আর শোষিত-শাসিত শ্রেণির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হতে হতে এসে বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এবং কী ভাবে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক শ্রেণি এবং ধনিক শ্রেণি সংঘর্ষের পথে ধনিক শ্রেণি তথা সর্বপ্রকার শোষক শ্রেণির শ্রেণি-শোষণকে ধ্বংস করে দিয়ে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবে মানব সমাজের বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সমাজ বিজ্ঞান তাঁর পরিবর্তনের নিয়ম কানুনগুলি তুলে ধরে আমাদের সামনে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শাখাও পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের মতো নিজের নিজের ক্ষেত্রের বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা তত্ত্বগুলিকে তুলে ধরে।

এই সমস্ত শাখাগুলিকে যখন আমরা একেবারে একই সঙ্গে নিজেদের চোখের সামনে তুলে ধরি তখন তার মধ্যে থেকে কতগুলি সাধারণ সত্য আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

প্রথমত, আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিশেষ সত্যের ধারণাই এই সমস্ত বিজ্ঞানের কোনও না কোনওটার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আমাদের সমস্ত বিশেষ সত্যের ধারণাই বস্তুজগৎ সম্পর্কিত, বস্তুর কোনও বিশেষ রূপের অবস্থান সম্পর্কিত। এবং যেহেতু বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগের সর্বপ্রকার নিয়ম ও তত্ত্ব পরীক্ষিত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেহেতু বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনও নিয়ম বা তত্ত্বই মানুষের অলীক কল্পনা বা মনগড়া ধারণা থেকে উদ্ভূত নয়, সেই হেতু আমাদের যে সব ধারণা যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে কেবলমাত্র সেই সমস্ত জ্ঞান সেই সব ধারণাই সঠিক এবং সত্য।

দ্বিতীয়ত, মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে মনটা দিয়ে আমরা মানুষকে, সমাজকে, জগতকে বিচার করে দেখতে যাই সেই মনটা নিজেই একটা বিশেষ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। আজ যদি কারও মন বলে যে, এই পার্থিব বস্তু জগতের বাইরে বস্তুর ঊর্ধ্বে কোনও অতীন্দ্রিয় সত্তা আছে, তা হলে মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে এ সত্যটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব যে, তার মনের ওই চিন্তাটা সমাজের প্রচলিত সংস্কার এবং ধারণার থেকেই জন্মলাভ করেছে, যে সংস্কার যে ধারণা মানব সভ্যতার আদিযুগে বিজ্ঞানের অতি শৈশবে এক বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। যে হেতু আজকের মতো সামগ্রিকভাবে দুনিয়াকে জানার উপায় সেদিন বিজ্ঞানের ছিল না, সেইহেতু প্রচলিত শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সমাজের সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা বিধানের অধিকারী স্বৈরাচারী শাসকের একাধিপত্যই মানুষের মনে প্রতিফলিত হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের অন্তর্নিহিত নিয়মশৃঙ্খলার উৎস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। কাজেই জগৎ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে, সঠিক সামগ্রিক ধারণা গড়ে তুলতে হলে মানুষের নিজের মনগড়া ধারণার উপরে নির্ভর না করে আমাদের নির্ভর করতে হবে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যের উপর, কারণ মানুষের মনের উপর বস্তু জকৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যলব্ধ ধারণার প্রতিফলনই হচ্ছে বস্তু জগতের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, সত্য জ্ঞান।

বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলির পরীক্ষিত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্য থেকে যে সাধারণ সিদ্ধান্ত সমূহ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুরই অর্থাৎ জড়, জীব, মানুষ অথবা মানুষের সমাজ, মানুষের মন তথা চিন্তাজগৎ—এ সব কিছুরই আবির্ভাব ঘটেছে বস্তু থেকে। এখানে বস্তু বলতে কোনও বিশেষ একটা বস্তুকে বোঝায় না, সাধারণভাবে নির্বিশেষ বস্তুকে বোঝায়, যেমন মানুষ বলতে আমরা কোনও বিশেষ একটি মানুষকে বুঝি না, সাধারণভাবে মানুষকে বুঝি।

যে কোনও বিশেষ বস্তুরই আবির্ভাব ঘটছে আর একটা বিশেষ বস্তু থেকে, অর্থাৎ বস্তু ক্রমাগত পরিবর্তনের পথে একটা বিশেষ রূপ থেকে আর একটি বিশেষ রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে যে কোনও বিশেষ বস্তুরই জন্ম আছে—যা অন্য কোনও বিশেষ বস্তু থেকে রূপান্তর গ্রহণেরই নামান্তর, এবং মৃত্যু, যা অন্য কোনও বিশেষ বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ারই নামান্তর—তা-ও আছে। বস্তুর বিশেষ রূপের যেমন সৃষ্টি আছে তেমনি বিনাশও ঘটে। কিন্তু সাধারণভাবে বস্তুকে ধরলে তার নির্বিশেষ রূপের বিনাশের প্রশ্ন যেমন ওঠে না, সৃষ্টির প্রশ্নও তেমনি অবান্তর। সাধারণভাবে নির্বিশেষ বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। পৃথিবী, মানুষ মানুষের মন এগুলো বস্তুর বিশেষ বিশেষ রূপ মাত্র—কাজেই এদের ক্ষেত্রে অন্য বিশেষ রূপের বস্তুর মধ্য থেকে জন্ম বা সৃষ্টির প্রশ্নটা উঠতে পারে, কিন্তু যখন সাধারণভাবে বস্তুজগৎ বলা হয়—যে বস্তুজগতের মধ্যে পৃথিবী, মানুষ, মানুষের মন, গ্রহ-তারা-রবি-শশী সব কিছুই পড়ে যায়—সেই বস্তু জগতের আদি বা অন্ত বলতে কিছুই নেই। কাজেই এমন কোনও কিছুই বস্তুজগতের ভিতরে বা বাইরে নেই যা বস্তুনিরপেক্ষ। দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল, কোনও কিছুই চরম বা আদি বা চূড়ান্ত বা স্বয়ম্ভু নয়।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত থেকে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুই পরিবর্তনশীল, বস্তুর ক্রমাগত পরিবর্তনের পথে একটি বিশেষ বস্তু অন্য এক বিশেষ বস্তুতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং এই রূপান্তর বা পরিবর্তন যেহেতু সমস্ত বিশেষ বস্তুরই ধর্ম অতএব তা থেকে এ সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি যে—পরিবর্তন বস্তুর ধর্ম। এবং যেহেতু বস্তু সর্বদাই বিরাজ করে বিশেষ বস্তুর রূপে সেই হেতু বস্তু কখনও কোনও বিশেষ রূপে চিরকাল থাকতে পারে না, অর্থাৎ সনাতন, শাশ্বত, স্থায়ী, নিত্য বা ধ্রুব বস্তু বলে কোনও বস্তুই নাই। এই সবগুলি বিশেষণই শুধুমাত্র আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, অর্থাৎ বস্তুর কোনও বিশেষ রূপ অপেক্ষাকৃত কম স্থায়ী এবং এই অর্থে অস্থায়ী এবং কোনও বিশেষ রূপ তার চাইতে অধিকতর স্থায়ী বলা চলতে পারে।

তৃতীয়ত, সমস্ত বিশেষ বস্তুই একে অপরের সঙ্গে ক্রমাগত পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আসছে এবং এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সর্বদাই একে অপরের উপর কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। এখন এই সমস্ত বিশেষ বস্তুগুলিই আবার অপর কতগুলি বিশেষ বস্তুর দ্বারা গঠিত—যে বিশেষ বস্তুগুলি নিজেরা পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সেগুলি আবার নিজেদের উপর পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার করে চলে। এই ভাবে প্রতিটি বিশেষ বস্তুই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে চলে এবং এই দুই প্রকার দ্বন্দ্বের মধ্যে আবার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই মুখ্য, যেহেতু যে কোনও বিশেষ বস্তু বাইরের আর পাঁচটা বিশেষ বস্তুর সংস্পর্শে আসার সময়েই নিজে পরিবর্তিত হতে হতেই আসে—যে পরিবর্তন ঘটছে তার অভ্যন্তরীণ বস্তুগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলে।

চতুর্থত, বিজ্ঞানের সমস্ত বিশেষ শাখার বিশেষ সত্য বস্তুর পরিবর্তনেরও একটা সাধারণ রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। যে কোনও বস্তুই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে শেষপর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যেখানে এসে সে আর বর্তমান বিশেষ রূপটিকে

সাতের পাতায় দেখুন

ছাত্রসংসদ নির্বাচনের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ

ইউজিসি-র পূর্ব ভারতীয় দপ্তর তুলে দেওয়া, ছাত্রছাত্রীদের একাধিক স্কলারশিপ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে ও ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়।

ওই দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক সভায় সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক স্কলারশিপ বন্ধ করে দিয়েছে, যা সামাজিক ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় প্রধান প্রতিবন্ধক। পাশাপাশি ইউজিসির পূর্ব ভারতীয় দপ্তর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সল্টলেক ক্যাম্পাস থেকে দিল্লিতে সরিয়ে দিয়ে স্বশাসিত সংস্থাকে অবলুপ্ত করতে চাইছে। অন্য দিকে আলিয়া ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে চক্রান্ত করে অন্য সংস্থাকে হস্তান্তরিত করছে যা ছাত্র স্বার্থের চরম বিরোধী। ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া আদায়ের হাতিয়ার ছাত্র সংসদ নির্বাচন বহু বছর বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

সভায় কলকাতার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতিনিধিরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বেসরকারিকরণ, গৈরিকীকরণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভ সভায় মূল বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সামসুল আলম।

দার্জিলিংয়ে আশাকর্মীদের আলোচনা সভা

দার্জিলিংয়ের ঘুম হাইস্কুলে ১৮ ডিসেম্বর আশাকর্মীদের নিয়ে 'কেন এআইইউটিইউসি করব' শীর্ষক সেমিনার। উপস্থিত ছিলেন ১৫০ জন। আলোচক ছিলেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উপদেষ্টা সৌরভ মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন।

আসানসোলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু বিজেপি দায় এড়াতে পারে না

১৪ ডিসেম্বর আসানসোলে বিজেপির এক সভায় চরম বিশৃঙ্খলার পরিণতিতে দুই মহিলা সহ এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর দায় বিজেপি এড়াতে পারে না। সভায় কম্বল বিতরণের কর্মসূচি ছিল। একটা কম্বলের জন্য হুড়োহুড়ি করে ছোটা এবং পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু দেখিয়ে দেয়, মানুষের অবস্থা কত দুঃসহ। এই ঘটনা কেন্দ্রে ও রাজ্যে পরের পর সরকারগুলির উন্নয়নের বাদ্যির অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে দেয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ আসানসোল শাখার পক্ষ থেকে ১৫ ডিসেম্বর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই চূড়ান্ত অব্যবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের গ্রেপ্তার করা এবং নিহতদের পরিবার পিছু ৫০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

টেট যুদ্ধ

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় রবিবার। প্রভাত হইতেই বঙ্গদেশের রাজধানী সহ নগরে-শহরে সাজো-সাজো রব। পথঘাট আইনরক্ষকে ছয়লাপ। দেশে যে এত আইনকানুন রক্ষা করিবার লোক আছে, অন্য সময়ে বড় বুঝা যায় না।

নেতা-মন্ত্রীরা জালিয়াতি করিয়া, ঘুষ খাইয়া, হুমকি দিয়া কোটি কোটি টাকা জমাইতেছে, যত্রতত্র খেলিবার বল ভাবিয়া বোমা কুড়াইয়া পাইয়া বালক-বালিকা মারা যাইতেছে, চোলাই-সাট্টা-জুয়ার বন্যা বহিয়া যাইতেছে, খুন-জখম-নারীধর্ষণ তো গা সহাই হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ 'আজ প্রভাতে কী সুর বাজে?' 'সবাই বলে এ উহারে ব্যাপারটা কী, ব্যাপারটা কী?' ডিসেম্বরে ডেডলাইনের একটি আওয়াজ কয়মাস ধরিয়া শুনা যাইতেছিল। সেই লাইন আসিয়া পড়িল কি? রাজ্য সরকারের কি সত্যিই গণেশ উল্টাইল? রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের বৈদিক শাসন আসিয়া পড়িল নাকি? অকালে কি হঠাৎ আবার 'খেলা হইবে?' পাকিস্তানি জঙ্গিরা কি চোরাগোপ্তা হামলা চালাইল, না চিন নাথুলা পার হইয়া ঢুকিয়া পড়িল?

জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গেল যে, না। ব্যাপার অত সহজ নহে। তদপেক্ষাও গুরুতর। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকুল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হইবার জন্য পরীক্ষা দিবে। আর কে না জানে যে, এ রাজ্যে বর্তমান সরকার আসিবার পর হইতে যতবার শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষার আয়োজন করিতে গিয়াছে ততবারই বিরোধীরা সাঁট করিয়া নানা রকম অন্তর্ঘাত চালাইয়া তাহা ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছে? আর যে দু-একবার কোনও রকমে পরীক্ষা লওয়া গিয়াছে সেখানেও ধড়িবাজ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকুল পরীক্ষার হলে অজস্র প্রকার কায়দায় নানা রকম জালিয়াতি করিয়া, লিস্টে নাম তুলিয়া চাকুরি পাইয়া গিয়াছে। ইহাদের টুকলিফাই করিবার নানা প্রকার কায়দা-কানুনেরই ফলে আজ শিক্ষা দপ্তরের সৎ চরিত্রবান মহামান্য নেতাকর্তাদের শুভ্র ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অতএব এবারে আর চালাকি ন চলিষ্যতি। একেবারে কঠোরতম নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। পরীক্ষার্থীরা তো বটেই, এমনকি নজরদার শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও তিনঘন্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে। সকল মাছি তাড়াইতে হইবে। গতকল্য রাত্রে যে সকল মশককুল বেঞ্চ-চেয়ার-টেবিলের তলায় আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের মারিতে হইবে। কেন না, মশাগুলিও আজিকালি তাল বুঝিয়া বেয়াদবি শুরু করিয়াছে। চক্রান্ত করিয়া ডেঙ্গু ছড়াইতেছে। পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারাও মোবাইল ঘড়ি ব্যাগ টিফিন জল কিছুই আনিতে পারিবেন না। পেটে কিল মারিয়া পরীক্ষা দিতে ও নিতে হইবে। পরীক্ষার্থীরা কখন কিভাবে জালিয়াতি করে তাহার ঠিক কী? তাহারা ঘড়ি আংটি দুল নাকছাবি শাঁখা-পলা কিছুই পরিয়া ঢুকিতে পারিবে না। অতটুকু সব গহনার মধ্যে স্থাপনযোগ্য, পরীক্ষায় নকল করিবার উপযুক্ত কোনও 'ডিভাইস' আবিষ্কার করিবার কথা অ্যাপল কোম্পানিও এখনও কল্পনা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙালি তরুণ-তরুণীদের বিশ্বাস নাই! সব এক একটি জেমস বন্ডের চেলা। নাকছাবি হইতে বিষাক্ত গ্যাস বা লেজার রশ্মি ছুঁড়িয়া ইনভিজিলেটরকে ঘায়েল করিয়া প্রশ্নপত্র লইয়া জানালা হইতে লাফ মারিয়া মোটরবাইকের উপর পড়িয়া ছুট মারিলেই তো চিত্তির! পশ্চিমবঙ্গের এতদিনকার শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিশ্বখ্যাত স্বচ্ছতার একেবারে মাথায় বাড়ি!

অতএব খোলো সব। নাকছাবি না খুলিলে নাক কাটিয়া বাহিরে রাখিয়া পরীক্ষা দাও। হুঁ হুঁ বাবা। বাঙালি পুলিশকে তো চেনো না! উপরতলা হইতে একবার হুকুম আসিবার অপেক্ষা মাত্র। করোনা ভাইরাসের চাহিতেও দ্রুতবেগে থানা হইতে লাঠি বন্দুক লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া এলাকা ছাইয়া ফেলে।

যাহা হউক। বিরোধীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া টেট পরীক্ষা তো মহা সমারোহে হইয়া গেল। শিক্ষা প্রসারে কৃতসংকল্প মহামান্য রাজ্য সরকার বাহাদুরের কর্তাব্যক্তিরা শুধু চুরি করেন এই অপপ্রচার ভ্রান্ত প্রমাণিত হইল। দেখা গেল সুযোগ পাইলে তাঁহারা ছুটির দিনেও কাজ দেখাইয়া ফাটাইয়া ফেলিতে পারেন। তবে একটা কথা। এই পরীক্ষার ফলাফল কবে বাহির হইবে, তাহাতে কোন দেবতা কত কোটি টাকার খেলা খেলিবেন, ফলাফল বাহির যদি হয়ও, নির্বাচিত প্রার্থীদের কবে নিয়োগ হইবে, তার পূর্বে তাঁহাদের কয় বৎসর অনশন করিতে হইবে এবং মামলা লড়িতে হইবে এই সকল প্রশ্ন করিয়া সময় নষ্ট করিবেন না। ইহাদের উত্তর গুগলও জানে না, বেদেও কিছু বলা নাই।

উলুবেড়িয়ায় আশা ও আইসিডিএস কর্মীদের বিক্ষোভ

আবাস যোজনার সার্ভের কাজে নিয়োগ করার প্রতিবাদে হাওড়ার উলুবেড়িয়া-১ ব্লকে ১২ ডিসেম্বর আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পাঁশকুড়া জোনাল কমিটির আহ্বানে ১৫ ডিসেম্বর পাঁশকুড়া ও প্রতাপপুর কাস্টমার কেয়ার সেন্টার এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সহ সভাপতি নন্দ মাইতি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীরেন কর্মকার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস ও অফিস সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে নন্দ মাইতিকে সভাপতি, সুধীর মাইতি ও অসিত মান্নাকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১৭ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বিশ্বের ১০০টি প্রধান অস্ত্রব্যবসায়ীর তালিকায় ভারতেরও দুই সংস্থা

অস্ত্র ব্যবসার মতো লাভজনক ব্যবসা খুব কমই হয়। কোভিড অতিমারিতে যখন বহু ব্যবসায় লাভের হার কমেছে, তখন শুধু ভারতেই নয়, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অস্ত্র ব্যবসায় মুনাফার হার বেড়েছে। সুইডেনের থিঙ্কট্যাঙ্ক স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট ৫ ডিসেম্বর যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে এই চিত্র উঠে এসেছে।

বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায় প্রথম ১০০টি সংস্থার তালিকায় ভারতের রয়েছে দুটি সংস্থা—হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স (হ্যাল) এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স (ভেল)। এর মধ্যে হ্যাল-এর অবস্থান ৪২ নম্বরে, ভেল রয়েছে ৬৩ নম্বরে। গত বছরে হ্যালের অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ৩.৩ বিলিয়ন ডলার, ভেলের ১.৮ বিলিয়ন ডলার। প্রথম ১০০টি বৃহৎ অস্ত্র ব্যবসায়ীর তালিকায় চিনের রয়েছে ৮টি সংস্থা। তাদের সম্মিলিত অস্ত্র বিক্রি ১০৯ বিলিয়ন ডলারের। তালিকায় অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ আমেরিকা। ১০০টির মধ্যে আমেরিকার রয়েছে ৪০টি কোম্পানি। ২০২১ সালে তাদের বিক্রি ২৯৯ বিলিয়ন ডলারের। এর মধ্যে প্রথম তিনটি হল লকহিড মার্টিন (বিক্রি ৬০ বিলিয়ন ডলার), রেথিয়ন (বিক্রি ৪২ বিলিয়ন ডলার) এবং বোয়িং (৩৩ বিলিয়ন ডলার) (সূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া— ০৬.১২.২০২২) ।

দেশ রক্ষার আওয়াজ তুলে বিশ্বের সব পুঁজিবাদী দেশই বিপুল টাকা বরাদ্দ করে সামরিক খাতে। এই টাকা অস্ত্র কেনা, অস্ত্র তৈরি, যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগে। দেশে দেশে যুদ্ধ, সীমান্ত বিরোধ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মানুষের জীবনের অভিশাপ হলেও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে তা আর্শীবাদ।

গণদাবী পড়ুন ও গ্রাহক হোন

ভিঝিনজাম আন্দোলনকারীদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা

কেরালার ভিঝিনজামে মৎস্যজীবীদের উচ্ছেদ করে আদানি বন্দর স্থাপনের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনে সাময়িক বিরতি ঘোষিত হয়েছে। মৎস্যজীবীদের এই আন্দোলনকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কেরালা রাজ্য কমিটি।

বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে আদানি গ্রুপের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য কেরালার সিপিএম পরিচালিত সরকার কুৎসা এবং মিথ্যা অপবাদের যে বোঝা মৎস্যজীবীদের উপর চাপিয়ে দেয়, সেটাকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করেছেন মৎস্যজীবীরা। ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক ভাঙনের কারণে মৎস্যজীবীদের যে ২৮৪টি দরিদ্র পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে সিমেন্টের গোডাউনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, সরকার তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য ন্যূনতম সৌজন্যও দেখায়নি। মৎস্যজীবীদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে, সিপিএম নেতৃত্বাধীন শাসক ফ্রন্ট অত্যন্ত তৎপরতার সাথে সাম্প্রদায়িক বিজেপির সঙ্গে জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নেয়—কেরালার তুলনামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এমন একটি সাম্প্রদায়িক প্রচারের যে মারাত্মক পরিণতি হতে পারে তা বিবেচনা না করেই। মৎস্যজীবীদের সংগ্রামের বিরোধিতায় কুৎসিত ফ্যাসিবাদী পন্থা অবলম্বন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া থেকেও তারা পিছপা হয়নি।

এমনকি মৎস্যজীবী, যারা তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং সাহসী প্রচেষ্টার মাধ্যমে বন্যা বিপর্যস্ত এলাকা থেকে অসংখ্য বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করেছে এবং যারা মানুষের আন্তরিক প্রশংসা পেয়েছে, তাদের এখন সিপিএম সন্ত্রাসবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করছে। কী মর্মান্তিক পরিহাস! যথার্থ বামপন্থী চেতনা ধারণ করলে মৎস্যজীবী গরিব মানুষকে এভাবে দাগিয়ে দেওয়া সম্ভব হত? পুলিশকে ব্যবহার করে এই অসহায় মানুষগুলোর ওপর তারা বিরামহীন ভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তিন সহস্রাধিক আন্দোলনকারীর উপর মিথ্যা মামলা চাপিয়েছে। সমস্ত দমন-পীড়ন, কুৎসা, কলঙ্ক, অপপ্রচারকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করে, বিপুল শক্তিধর কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে ১৩৮ দিনের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন পরিচালনার মধ্যে দিয়ে সংগ্রামী মৎস্যজীবীরা লড়াইয়ের এক ঐতিহাসিক রাস্তা রচনা করেছে, যা আগামী দিনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সমস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রেরণা জোগাবে।

এই সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্ব এখনও পর্যন্ত এমন দাবি করেনি যে, এই আন্দোলনের সমস্ত দাবি অর্জিত হয়ে গেছে। তারা আরও স্পষ্ট করেছে যে, বর্তমান সময়ে আন্দোলনে সাময়িক বিরতি দিলেও তারা কোনও ভাবে খুশি নন। হয়তো সরকারি হুমকি, শাসানি, উৎপীড়নের সামনে এই আন্দোলন সাময়িক মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। এই বিরতির প্রয়োজনও আছে। কিন্তু আন্দোলন আবার মাথা তুলবে। নেতৃত্বের এই বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ আন্দোলনের বাস্তব জটিলতাকে গুরুত্ব সহকারে বুঝতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয়, এই কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখানো হয়েছে, তার সপক্ষে সাধারণ মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

মৎস্যজীবীদের দাবি সরকার মানতে চায়নি। এরকম একটি উদাসীন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে কী ভাবে দাবি আদায় হয়েছে, এই মাপকাঠির ভিত্তিতেই কেবলমাত্র যেকোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফল পরিণতি সম্পর্কে মূল্যায়ন সম্ভব। ভিঝিনজাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের সাথে জড়িত জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা, ভ্রাতৃত্ববোধের একটা উচ্চ ধারণা তৈরি হয়েছে এবং আন্দোলনকারীদের আস্থা বাড়িয়েছে। এই আন্দোলন নিশ্চিতভাবে এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে যেকোনও আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করবে। উপকূলবর্তী এলাকার মানুষের এই লড়াই কেরালার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে আদানি বন্দর প্রকল্পের সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ ধ্বংসকারী প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

বহুজাতিক আদানি বন্দরের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য সিপিএম প্রকাশ্যে যেভাবে বিজেপির সাথে হাত মেলালো, তার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ পরিষ্কার বুঝে গেছে এই সমস্ত দলগুলি পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কাজ করে। সমস্ত সংসদীয় দলগুলি আগ্রাসী পুঁজিপতিদের স্বার্থকেই রক্ষা করে। এই আন্দোলনের উত্তাপ থেকে মানুষ উপলব্ধি করেছে যে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা নয়, সমস্ত সংসদীয় ভোটকেন্দ্রিক দলগুলি পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত। এই উন্নত চেতনা আগামী দিনে আরও অনেক আন্দোলনের রাস্তা প্রশস্ত করবে। আন্দোলন সম্পর্কে এই স্বচ্ছ ধারণা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আন্দোলনের জন্ম দেবে। কর্পোরেট শক্তিগুলি খনিজ সম্পদ, সমুদ্র ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের অর্থনীতি এবং উপকূলীয় এলাকার বৃহদাকার নির্মাণের জন্য উপকূলের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদে যেভাবে তাদের শোষণের ক্ষেত্র প্রসারিত করছে, তাতে মানুষের সমস্যা প্রতিনিয়ত আরও বাড়বে এবং তাদের জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। একমাত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রাস্তাতেই এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব—ভিঝিনজাম আন্দোলনের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

যেহেতু সমস্ত সরকারের নীতি ও তার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে একচেটিয়া পুঁজির সেবা করার স্বার্থে পরিচালিত হয়, সেই কারণে গণআন্দোলনের সম্পূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য প্রয়োজন লাগাতার আন্দোলন। সরকারি নীতির প্রয়োগে যারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং সরকারের বিপজ্জনক নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে পারে আন্দোলনই। গণকমিটিই একমাত্র জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার। আন্দোলনের নেতৃত্বকে আন্দোলনের স্বার্থে এগিয়ে আসা সকল জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কোনও ক্ষতিকারক শক্তি যাতে এই আন্দোলনে ঢুকে একে সাম্প্রদায়িক বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দেগে দিতে না পারে, সেজন্য নেতৃত্বকে সতর্ক থাকতে হবে। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন যা ফ্যাসিস্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে মাথা নত করতে বাধ্য করেছিল এবং কেরালার সিলভার লাইন বিরোধী আন্দোলন যা রাজ্য সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল, তা ভিঝিনজাম আন্দোলনে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। এই আন্দোলনগুলির মূল্যবান অভিজ্ঞতা জনগণকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ধনকুবের গোষ্ঠী এবং তাদের রাজনৈতিক দালালদের সর্বনাশা নীতি থেকে কেরালা রাজ্যকে বাঁচাতে মৎস্যজীবী সহ ভিঝিনজামের উপকূলবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে রাজ্যের সমস্ত স্তরের মেহনতি জনগণকে এই আন্দোলনকে রক্ষা করতে হবে, তার পক্ষে এসে দাঁড়াতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

মল্লিকঘাট ফুলবাজারকে আধুনিক ফুলবাজার হিসাবে গড়ে তোলা, বাজার সংলগ্ন ভাঙা ব্রিজ নতুন করে নির্মাণ, বাগনানে সরকারি উদ্যোগে নির্মিত ফুলবাজার অবিলম্বে চালু, পাঁশকুড়া ফুলবাজারের বন্ধ ফুলের হিমঘর পুনরায় চালু, পানশিলা ফুলবাজার অতি দ্রুত চালু, কোলাঘাট ফুলবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, রাজ্যের কয়েক লক্ষ ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী পরিবার এই পেশার সাথে যুক্ত থাকলেও আজও রাজ্য সরকার ফুলবাজারগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। হাজার হাজার চাষিদের প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফুল বিক্রি করতে হয়। বিভাগীয় দপ্তর সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন আধিকারিকদের জানিয়েও কোনও ফল না হওয়ায় ১৬ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতার খোলসটাও খসে পড়ছে

ক্ষমতায় আসার পর সংসদে ঢোকার সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এ হল গণতন্ত্রের মন্দির। সেই মন্দিরে সাজানো বিগ্রহ রূপেও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আর রাখছে না বিজেপি সরকার।

সংসদ, বিচারবিভাগ, সরকার— বুর্জোয়া গণতন্ত্রে একদা এই তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্র স্বাধীনতা, ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট ছিল। একচেটিয়া পুঁজির দাপটের যুগে তা ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপি সরকারের হাত ধরে সেই লয়ের গতি আরও বাড়ছে। ১৫ অক্টোবর গুজরাটে আইনমন্ত্রীদের সম্মেলনে দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, সরকার হোক বা সংসদ বা আদালত, এই তিনই সংবিধানরূপী এক মায়ের তিন সন্তান। এই তিনটির মধ্যে বিবাদের কোনও জায়গা সংবিধানের আত্মায় নেই।

'বিবাদের জায়গা নেই' বলে প্রধানমন্ত্রী কি বোঝাতে চাইছেন, এগুলির কোনও স্বাধীন সত্তা থাকবে না? অন্তত তাঁর সরকারের কার্যকলাপে তাই তো মনে হয়। এগুলির যতটুকু নিজস্ব স্বাধীন সত্তা আজও অবশিষ্ট রয়েছে, সংসদ, বিচারবিভাগ, প্রশাসনে মাঝে মাঝে কেউ যতটুকু নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেন, সেটুকু ভূমিকাও প্রধানমন্ত্রীর 'অন্তরাত্মা' মানে তো! বাস্তবে তো মনে হয় না।

প্রধানমন্ত্রী কথিত 'সংবিধানের আত্মা'-র অন্যতম হল সংসদ। সেখানে বিরোধী মতের তোয়াক্কা না করে ২০২১-এ বর্ষাকালীন অধিবেশনে মাত্র ১০ মিনিটে ১৪টি বিল পাশ করানোর রেকর্ড করতে পারে কী করে বিজেপি সরকার? বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরাও অস্বীকার করতে পারেন না— আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কের পরিবেশ হল গণতন্ত্রের প্রাণ। শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, বিরোধী সদস্যদের আলোচনার দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৌশলে আইন পাস করিয়ে নেওয়ার যে নজির সংসদে রচিত হয়ে চলেছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে বড় বিপদ। গণতন্ত্রের ধারণায় সংসদ, বিধানসভা বিরোধীপক্ষের জন্যই। অথচ আজ সংসদে আলোচনার পরিস্থিতিই নেই। সংসদীয় কমিটিগুলিও ঠুঁটো জগন্নাথ। বিরোধীরা যে ক'টি কমিটির শীর্ষে ছিল, তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এমনকি সংসদকে এড়িয়ে সরকার নানা জনবিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

বিচারব্যবস্থাকেও সরকার এবং আমলাতন্ত্রের আজ্ঞাবহ করে তুলতে চেষ্টার শেষ নেই। বিচারব্যবস্থাকে পুরোপুরি সরকার-নির্ভর করে তুলতে চাইছে বিজেপি। বিচারপতি নিয়োগে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটছে। কলেজিয়াম ব্যবস্থায় বিচারপতি নিয়োগে যতটুকু স্বচ্ছতা ছিল, তার বিরুদ্ধে বারবার বিষোদগার করছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, যা আসলে বিজেপিরই গোপন অ্যাজেন্ডা। বিচারকের অভাবে কয়েক কোটি মামলা ঝুলে থাকলেও বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সরকারের কোনও তৎপরতা নেই। নিজেদের 'জো হুজুর' কাউকে পাওয়া না গেলে বিচারপতি নিয়োগ বন্ধ করছে বা দেরি করিয়ে দিচ্ছে সরকার। মন্ত্রীরা ঠিক করে দিচ্ছেন, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্ট কোন বিচার করবে, আর কোনটা করবে না। আইনমন্ত্রী বলেছেন, জামিনের আর্জি, তুচ্ছ বিষয়ে জনস্বার্থ মামলা শোনার প্রয়োজন নেই সুপ্রিম কোর্টের। সরকারের সমালোচনা করার অপরাধে একের পর এক সাংবাদিক, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবীদের বিজেপি সরকার জেলবন্দি করছে। সরকারের চোখ রাঙানিতে নিম্ন আদালত জামিন দিতে ভয় পেয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটছে। অবশেষে হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্টে আসতে হয়েছে সামান্য জামিনের জন্য। এটাই মন্ত্রীমশায়ের গোঁসার কারণ। এই ভাবে বিচারব্যবস্থাকেও মোদি সরকার নিজের সম্প্রসারিত অঙ্গে পরিণত করছে।

বিচারপতি কে এম জোসেফ, বিচারপতি এ এ কুরেশি, বিচারপতি তাহিলরামানি সহ সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া নির্ভীক বিচারপতিদের সঙ্গে সরকার যে ব্যবহার করেছে তা বিচারব্যবস্থাকে সরাসরি নিজের আজ্ঞাবহ করার প্রচেষ্টার বড় উদাহরণ। শুধু তাই নয়, গুজরাটের নারোদা পাটিয়া গণহত্যা মামলায় ৯৭ জন মানুষকে হত্যার দায়ে সাজা পেয়েছিলেন বিজেপির প্রাক্তন মন্ত্রী মায়াবেন কোডনানি। তাঁর শাস্তি সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টের সাত জন বিচারপতি মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন, একাধিক বিচারপতি প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন। শেষে গুজরাট হাইকোর্ট তাঁকে মুক্তি দেয়। হাইকোর্ট বলে, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণের চেষ্টাই করেনি গুজরাট পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল 'সিট'।

কংগ্রেস আমলেও বিচারব্যবস্থাকে সরকারের তাঁবেদারে পরিণত করার চেষ্টা সব সময় হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন 'কমিটেড জুডিশিয়ারি' শব্দবন্ধটি। অর্থাৎ বিচারবিভাগের টিকি বাঁধা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাদের হাতে। সব সরকারই সেই পথেই বিচারবিভাগকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু বিজেপি আমলে তা আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক বাহক সব দলই কম-বেশি এই অগণতান্ত্রিক ধারা বহন করছে। কেন সংসদের মতো একটা উচ্চতম প্রতিষ্ঠানে এভাবে গণতন্ত্র খর্ব হচ্ছে? পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শুরুর দিকে সংসদে যতটুকু গণতন্ত্রের চর্চা হত, তর্ক-বিতর্ক হত, কেন তার বিলুপ্তি ঘটছে? এর কারণ হল পুঁজির কেন্দ্রীকরণের পথে রাষ্ট্র ক্রমাগত ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠছে। পুঁজি যত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, একচেটিয়া রূপ নিচ্ছে, তত তার আধিপত্যবাদী ক্ষমতা বাড়ছে, তত সে আগ্রাসী হচ্ছে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রথম যুগে যতদিন অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ ছিল, পুঁজির একচেটিয়া রূপ আসেনি, ততদিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নানা মত, চিন্তার অবাধ প্রকাশ, তর্কবিতর্কের সুযোগ ছিল, সংসদে তার প্রতিফলন ঘটত। কিন্তু পুঁজির একচেটিয়াকরণ ও চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবনের ফলে এই অবাধ আলোচনার সুযোগ আর অবশিষ্ট নেই। সংসদ সহ সব প্রতিষ্ঠানে তার ছাপ পড়ছে। সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর ইচ্ছায় এবং তাদের প্রভাবিত আমলাতন্ত্রের কঠিন ফাঁসের মাধ্যমে। দেশের আইন-কানুন, বিচারবিভাগ, পুলিশ-প্রশাসন সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। একচেটিয়া পুঁজিপতি আর রাষ্ট্র সমার্থক হয়ে গেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নির্দেশ দিচ্ছে, রাষ্ট্র— বকলমে সরকার সেগুলি পালন করছে। আসলে সরকার পুঁজিপতিদের লেজুড়বৃত্তি করছে। আর এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থ পূরণে দেশের জনগণের কণ্ঠরোধ করছে, সমালোচনা তর্ক-বিতর্ককে পদদলিত করছে, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করছে, সরকারের সমালোচনা করলেই সাংবাদিকদের জামিন অযোগ্য ধারায় আটক করে রাখছে। এমনকী এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আইনের মাধ্যমে নির্বাচনী বন্ডকে বৈধ করিয়ে রাজনৈতিক দলকে প্রভাবিত করছে। দেখা যাচ্ছে, বন্ডের ৮৫ শতাংশই শাসক দল বিজেপির দখলে। এই একচেটিয়া পুঁজি মালিকরাই কোন দলকে তুলবে, কাকে ফেলবে তা ঠিক করছে। পুঁজির শক্তিই নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করায় তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় কারা বসবে, এমনকী কে মন্ত্রী হবে, কোন দপ্তরের মন্ত্রী হবে, সেটাও এরাই ঠিক করে দেয়। জানা গেছে, পূর্বতন তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের নাম আম্বানিরাই ঠিক করে দিয়েছিল। কংগ্রেস আমলে টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি ফাঁস হতে দেখা গিয়েছিল, অভিযুক্ত টেলিকম মন্ত্রী হিসাবে এ রাজার নাম টাটা গোষ্ঠীর সুপারিশেই এসেছিল।

ফলে পার্লামেন্ট একচেটিয়া পুঁজির দাসত্ব করছে ও প্রশাসন হয়ে উঠেছে বেপরোয়া ভাবে ফ্যাসিস্টিক। পুঁজিবাদ চূড়ান্ত একচেটিয়া রূপ নেওয়ায় দেশের মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারও দিতে নারাজ। সেজন্য প্রয়োজন হলে সংসদকে রবার স্ট্যাম্পের মতো ব্যবহার করতেও পিছপা নয়। ইউএপিএ সহ সন্ত্রাস দমনকারী নানা আইন, দেশদ্রোহী হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার আইন পাশ করিয়ে বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক করে রাখা হচ্ছে। আসলে সরকার, সংসদ ও বিচারবিভাগকে এক ছাতার তলায় আনতে পারলে রাষ্ট্রের স্বৈরশাসনই আরও পাকাপোক্ত হবে।

আজ পুঁজিবাদের চরম ক্ষয়িষ্ণু যুগ। এই ব্যবস্থার রক্ষক ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের কাজকর্মের বিরোধিতার, প্রশ্ন তোলার বিন্দুমাত্র আভাস পেলেই তা রুখতে খড়্গহস্ত। সেজন্য সংসদের মাধ্যমে, বিচারবিভাগের দ্বারা বা পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করছে। অক্টোপাসের মতো সব দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে দম আটকে তাদের দমন করছে সরকার। জনসাধারণকে ঠিক করতে হবে, তারা শাসকের এই স্বৈরতন্ত্রকে মেনে নেবেন, না কি এর প্রতিবাদ করবেন?

শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, বিরোধী সদস্যদের আলোচনার দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কৌশলে আইন পাস করিয়ে নেওয়ার যে নজির সংসদে রচিত হয়ে চলেছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে বড় বিপদ। গণতন্ত্রের ধারণায় সংসদ, বিধানসভা বিরোধীপক্ষের জন্যই। অথচ আজ সংসদে আলোচনার পরিস্থিতিই নেই। সংসদীয় কমিটিগুলিও ঠুঁটো জগন্নাথ।

অধ্যাপকদের বিক্ষোভ-অবস্থান

উচ্চশিক্ষায় মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট, ক্লাস্টার অফ কলেজ, অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট, চার বছরের গবেষণা সহ ডিগ্রি কোর্স, নয়া পিএইচডি রেগুলেশন, প্রফেসর অফ প্র্যাকটিস সহ এক গুচ্ছ নির্দেশ জারির প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে ইউজিসি-র পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ-এর নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি পেশ করে। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, ডঃ অমিতাভ দত্ত, অধ্যাপক গৌতম মাইতি, অধ্যাপক মানস জানা সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃত্ব।

বক্তারা বলেন, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ইনস্টিটিউট ও অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট চালুর মাধ্যমে জ্ঞানের গভীরতা যেমন কমবে, ড্রপ আউট-এর সম্ভাবনাও বাড়বে। ক্লাস্টার অফ কলেজ চালুর মাধ্যমে প্রান্তিক কলেজগুলি আরও রুগ্ন হবে এবং এগুলোর পরিকাঠামো পিপিপি মডেল-এর মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাকে হস্তান্তরিত করা হবে।

দাম চড়িয়ে রেখেছে সরকার

একের পাতার পর

দেশগুলি ইউক্রেনকে প্রকাশ্যেই অস্ত্র এবং অর্থ সরবরাহ করছে। এই অবস্থায় একদিকে যেমন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাশিয়ার খরচের জোগান বজায় রাখার তাগিদ রয়েছে, তেমনই তেলের খনিগুলি থেকে উত্তোলিত তেল না বেচে তার উপায় নেই। কারণ যে বিপুল পরিমাণ তেল রাশিয়া উৎপাদন করে তা যেমন জমিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তেমনই উৎপাদনের প্রক্রিয়াও বন্ধ করা যায় না। তাই লকডাউনে তেল উৎপাদক সংস্থাগুলিকে শূন্য ডলারেও তেল বেচতে হয়েছে। এই অবস্থায় ভারত যে ৪০ ডলারের থেকে অনেক কম দামেই তেল হাতিয়ে নিচ্ছে তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অন্য দেশগুলি থেকে ভারতের তেল কেনা বন্ধ করা থেকেও এ সত্য স্পষ্ট।

তা হলে জলের দামে যে তেল দেশীয় কোম্পানিগুলি কিনছে তার সুবিধা দেশের জনগণ পাবে না কেন? তেলের চড়া দামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে প্রতিটি জিনিসের দাম। গণপরিবহণের খরচও এই অজুহাতে আকাশ ছুঁয়েছে। লকডাউন সাধারণ মানুষের জীবন ছারখার করে দিয়ে গেছে। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে রোজগারহীন হয়ে পড়েছে। যাদের কাজ কোনও ক্রমে রক্ষা পেয়েছে তাদেরও অধিকাংশই অনেক কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই অবস্থায় যে কোনও একটি গণতান্ত্রিক সরকার, যে জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা এতটুকু ভাবে, তার তো তেলের উপর ট্যাক্স কমিয়ে, কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফায় লাগাম পরিয়ে দাম জনগণের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের জীবন-যন্ত্রণার কিছুটা সুরাহা করার কথা! অথচ দেশের মানুষ দেখছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তেলের দাম এতটুকুও না কমিয়ে জনগণের জন্য মাত্রাছাড়া দুর্দশা আর তেল কোম্পানিগুলির জন্য সীমাহীন লুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

তেল কোম্পানিগুলি একদিকে যেমন জলের দামে তেল কিনে তা আগুন দামে দেশের জনগণের কাছে বেচছে, তেমনই ইউরোপের বাজারেও চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল মুনাফা করছে। স্বাভাবিক ভাবেই বহু মানুষ এই প্রশ্ন করছেন যে, একটি নির্বাচিত সরকার কি এমন নির্লজ্জ ভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থকে দু'পায়ে মাড়িয়ে শুধু তেল কোম্পানিগুলির স্বার্থ দেখতে পারে? দেশের মানুষের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে তারা ফুৎকারে উড়িয়েই বা দিতে পারছে কী করে?

পারছে এই কারণে যে, যতই দেশের মানুষ মনে করুক যে এটি একটি নির্বাচিত সরকার, অতএব একটি গণতান্ত্রিক সরকার, বাস্তবে এই সরকার দেশের শিল্পপতি-পুঁজিপতিদেরই সরকার। শুধুমাত্র তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী সরকার। তাদের দ্বারাই নির্বাচিত সরকার। তাদের টাকার থলি, তাদের প্রচার কাজে লাগিয়ে তাদেরই পছন্দে তৈরি হওয়া সরকার। সরকার নির্বাচনে পুঁজিপতিদের প্রভাব আজ এতখানি যে, তারা শুধু কে কোন দপ্তরের মন্ত্রী হবে তা-ই ঠিক করে দেয় না, কে কোন কেন্দ্রে প্রার্থী হবে তা-ও ঠিক করে দেয়। কংগ্রেসের মনমোহন সিংয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে টু-জি কেলেঙ্কারির তদন্তে উঠে এসেছিল, তৎকালীন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা ছিলেন টাটাদের মনোনীত। বিজেপি শাসনে তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ছিলেন আম্বানিদের মনোনীত। বর্তমান তেলমন্ত্রী হরদীপ পুরী যে ভাবে তেল কোম্পানিগুলির লোকসানের গল্প একঘেয়ে সুরে গেয়ে চলেছেন তাতে তিনি যে কোম্পানিগুলিরই ঘরের লোক তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই তেলমন্ত্রীর উমেদারিতেই অর্থমন্ত্রক গ্যাস উৎপাদনে 'লোকসান হচ্ছে' এমন হাস্যকর দাবি মেনে তেল কোম্পানিগুলিকে ২২,০০০ কোটি টাকা পুষিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ মুখে যা-ই বলা হোক, বাস্তবে এই সরকার শিল্পপতিদের দ্বারা, শিল্পপতিদের জন্য, শিল্পপতিদেরই সরকার।

সরকার এমন একটা চরম অন্যায় লাগাতার চালিয়ে যেতে পারছে আরও একটি কারণে। সরকারের ধুরন্ধর নেতা-মন্ত্রীরা জানে, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই প্রভৃতি কারণে জনগণের অসন্তোষ যতই বাড়ুক, বাস্তবে এই বিক্ষুব্ধ জনগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত। বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারবে না। এই অবস্থায় তেল-গ্যাসের দাম কমানোর মতো জনগণের ন্যায্য দাবিগুলিকে সরকারকে মানতে বাধ্য করতে হলে এই বিচ্ছিন্ন ক্ষুব্ধ জনগণকে সংগঠিত ভাবে, ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তথাকথিত বিরোধী দলগুলি আজ বাস্তবে তাদের বিরোধী ভূমিকা ত্যাগ করেছে। তাই জনগণকে সঠিক নেতৃত্ব চিনে নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। আন্দোলন তুঙ্গে তুলে সরকারকে বাধ্য করতে হবে ন্যায্য দাবি মানতে।

১৮ ডিসেম্বর প্রতাপগড়ে দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির প্রয়াত সম্পাদক কমরেড পুষ্পেন্দ্র স্মরণে সভা। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং (ছবিতে ভাষণরত)। সভাপতিত্ব করেন প্রতাপগড় জেলা সম্পাদক কমরেড বেচন আলি

মৈপীঠ ঃ তৃণমূলী গণতন্ত্রের নমুনা

একের পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেস যারা যখন সরকারে এসেছে তারাই পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের একমাত্র দল এস ইউ সি আই (সি)-কে নিশ্চিহ্ন করতে খুনে বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। শাসকদলকে তোয়াজ না করলে মারধর, মহিলাদের সম্ভ্রমহানি, হুমকি, ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, জমির ফসল কেটে নেওয়া, পুকুরে বিষ ঢেলে দেওয়া এসব চলছেই।

এর মধ্যেই এস ইউ সি আই (সি) মৈপীঠ আঞ্চলিক কমিটি উদ্যোগ নিয়েছে মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর চিন্তা ও শিক্ষা প্রচারের নানা কর্মসূচি গ্রহণের। সেই উদ্দেশ্যে একটি জনসভার জন্য স্থানীয় থানার কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় দু-মাস ধরে বারবার পুলিশের কাছে অনুমতি চাইলেও শাসকদলের কথায় পুলিশ প্রশাসন জনসভার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা করে জনসভার অনুমতি আদায় করে এস ইউ সি আই (সি)।

১৪ ডিসেম্বর মৈপীঠ অঞ্চলের শনিবার বাজারে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভা পণ্ড করতে আগের রাত থেকে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি ও হুমকি দিতে থাকে। সে সব উপেক্ষা করে শত শত মানুষ এই জনসভায় উপস্থিত হন। সভার আগে দৃপ্ত মিছিলে অংশ নেন কয়েক শত মানুষ। সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর এবং প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার।

তাঁরা বলেন, অত্যাচারীরা কখনও শেষ কথা বলে না। সমস্ত সন্ত্রাস দুর্নীতি স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে আবার মৈপীঠের মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবেই। দেশ জুড়ে বিজেপি এবং রাজ্যে রাজ্যে টিএমসি, সিপিএম সহ অন্যান্য দলের মানুষমারা নীতির বিরুদ্ধে এসইউসিআই(সি) লড়ছে। সেই লড়াইয়ে মৈপীঠের মানুষ জান-প্রাণ দিয়ে আগেও যেমন থেকেছেন, আগামী দিনেও তাঁরা একইরকম ভাবে তাতে অংশ নেবেন।

শিলিগুড়ির দক্ষিণ পলাশে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীকে পাশবিক নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ১৫ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি) শিলিগুড়ি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে কোর্ট মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়

দর্শন বলতে কী বুঝি

তিনের পাতার পর

সেই বিশেষ রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও ধর্মকে আর ধরে রাখতে পারে না। পরিবর্তনের পথে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখা যায় সেই আগের রূপ আগের বৈশিষ্ট্য, আগের ধর্ম— এ সব কিছুই অন্তর্হিত হয়েছে বস্তুর এক নতুন রূপের মধ্যে, যে রূপের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মের। এক-দুই-তিন ডিগ্রি করে উঠতে উঠতে একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় উঠে দেখা যায় জল আর জল নেই, বাষ্প হয়ে গেছে— তার রূপ, গুণ, আকৃতি, প্রকৃতি সব গেছে পাল্টে। এক-দুই-তিন করে কাটতে কাটতে পনের বছরে পা দিয়েই ছেলেটা আর ছেলে থাকে না, যুবক হয়ে যায়। মেয়েটা মা-বাপের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয় হঠাৎ শাড়ি পরে। বস্তুর এই যে বিচিত্র পরিবর্তনের ধারা— ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে একটু একটু করে পরিবর্তন হতে হতে হঠাৎ একদিন একেবারে খোল-নলচে পাল্টে ফেলে নতুন রূপে দর্শন দেওয়া— এ-ও কি শুধু এই নতুন রূপে চিরস্থায়ী ভাবে বিরাজ করবার জন্যেই? বাস্তব ঘটনা এই 'চিরস্থায়ী' অবস্থানের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে।

পরিবর্তন মানেই একের মৃত্যু অন্যের জন্ম আর সদাসর্বদা পরিবর্তনই যেখানে বস্তুর ধর্ম সেখানে এই পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে, একটি বিশেষ রূপের অবস্থানের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আর একটি বিশেষ রূপের অবস্থানের জন্মের পথে নতুনতর এক বিশেষ রূপে রূপান্তরিত হওয়ার অন্তহীন ধারাপ্রবাহ। একটি বিশেষ বস্তুর বিকাশের পথেই সেই বিশেষ বস্তুর অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করতে করতে বস্তু ক্রমাগত বিকশিত ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। এবং এই ভাবেই এক নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের প্রবাহে বস্তুজগতে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপে, জটিল থেকে জটিলতর রূপে, ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর রূপে পরিবর্তনশীল বস্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলেছে। (চলবে)

(এই নিবন্ধটি ১৯৬২ সালে গণদাবী ১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা থেকে ৯ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পুনঃপ্রকাশ করা হল। এ বার দ্বিতীয় অংশ)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

আশা ও আইসিডিএস কর্মীরা রাজপথে

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং ওয়েস্টবেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স (আইসিডিএস) ইউনিয়ন ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মিছিল করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই কর্মীদের উপর কাজের বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং স্বরূপনগরে কাজের চাপ নিতে না পেরে আইসিডিএস কর্মীর আত্মহত্যায় প্রশাসনকে ধিক্কার জানিয়ে এদিন সোচ্চার হন কর্মী-সহায়িকারা।

আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ
আশা-আইসিডিএস কর্মীদের উপর চাপানোর প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকার যাদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতিটুকুও দিতে নারাজ, সেই আশা এবং আইসিডিএস কর্মীদের ঘাড়ে রাজ্য সরকার চাপিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্লাস ভেরিফিকেশনের কাজ। ২ ডিসেম্বর রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর এবং নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তর নির্দেশ দিয়েছিল, এই যোজনায় ঘর প্রাপকদের তালিকা খতিয়ে দেখার কাজে তাদের ৩ ডিসেম্বর থেকেই নেমে পড়তে হবে এবং সাত দিনের মধ্যে এক দফা রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এই কর্মীদের উপরে কাজের চাপ এমনিতেই খুব বেশি, এর উপর নতুন এই চাপ ওই কর্মীদের শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই সব কাজ তাদের করার কথা নয়। এই তালিকা করার না আছে তাদের অধিকার এবং না দেওয়া হয়েছে কোনও ক্ষমতা। কাদের নামে ঘর বরাদ্দ হয়েছে তার তালিকা এলাকার শাসক দল ও প্রভাবশালীরা আগে থেকে তৈরি করে রাখে। ফলে তার উপর কলম চালাতে গেলে এলাকার মানুষের সাথে কর্মীদের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। একথা সকলের জানা যে এই তালিকাতে বহু বেনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল ক্ষোভও আছে। এই ক্ষোভকে চাপা দিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার হাজার হাজার শূন্য পদে নিয়োগ না করে যখনই স্বল্প সময়ের বিভিন্ন ধরনের কাজ আসে তখনই দপ্তর বহির্ভূত আশা, আইসিডিএস সহ স্কিম ওয়ার্কারদের উপর অন্যায় ভাবে তা চাপিয়ে দেয়। চাপ সামলাতে না পেরে ওই কর্মীদের অনেকে মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছেন, চাপের ফলে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়ায় এক আশাকর্মীর ৩ বিঘা জমির ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটছে। ১১ ডিসেম্বর স্বরূপনগরে একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করার পর সর্বত্রই আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জেলায় জেলায় এই নির্যাতন অব্যাহত। আটকে রাখা, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, চাষের ফসল নষ্ট করা এবং ধনে-প্রাণে শেষ করে দেওয়ার ভয় দেখানো, হুমকি প্রতি মুহূর্তে চলছে।

এই পরিস্থিতিতে ৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ভবনে আশার মিশন ডিরেক্টরের কাছে ডেপুটেশন দেয় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। ৬ ডিসেম্বর ইউনিয়ন নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরে এবং ৯ ডিসেম্বর মুখ্যসচিবকে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। ১৩ ডিসেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অঙ্গনওয়াড়ি এবং আশাকর্মীরা কলকাতায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভ। যেদিন থেকে সরকার কাজ শুরু করতে বলেছে সেই দিন থেকেই রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বিক্ষোভ শুরু হয়। ইউনিয়ন এই কাজ বয়কট করার ডাক দেয়। প্রশাসনের চাপ ও হুমকি সত্ত্বেও রাজ্যের ১৩-১৪টি জেলাতে আশাকর্মীরা কাজ পরিপূর্ণ বয়কট করেন। বাকি জেলায় লড়াই চলতে থাকে। কাজ না করলে শো-কজ এবং ভাতার টাকা কেটে নেওয়ার হুমকি, অন্য দিকে শাসকদল এবং এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেখে নেওয়ার হুমকি— এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কর্মীরা যতদূর সম্ভব সরকারের অন্যায় দাবি প্রতিরোধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র দাবি, মৃত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, সমস্ত কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, এই কাজ

কলকাতায় ১৩ ডিসেম্বর এআইইউটিইউসি-র সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

এবং দপ্তর বহির্ভূত কোনও কাজ কর্মীদের উপরে চাপানো চলবে না এবং আশা-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে।

কাশীপুরে উচ্ছেদ বিরোধী সভা

পুনর্বাসন ছাড়া রেল কলোনি উচ্ছেদের প্রতিবাদে ১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় কাশীপুর রিজেন্ট সিনেমা মোড়ে শতাধিক মানুষের এক সভা হয়। বক্তব্য রাখেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের ৬ নং ওয়ার্ড শাখার নেতৃবৃন্দ। আন্দোলনে সাধারণ মানুষের ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে মূল বক্তব্য পেশ করেন মঞ্চের নেতা শান্তি ঘোষ।

১২ দফা দাবিতে
জয়নগরে বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ

সকল গৃহে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদান, এই প্রকল্পের কাজ চালু করা, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রদান, মিড ডে মিল সহ সমস্ত সরকারি প্রকল্পে লাগামহীন দুর্নীতি বন্ধ করা, জমির প্রকৃত মালিক ও পাট্টাদারদের নাম রেকর্ডভুক্ত করা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ প্রাপকদের অবিলম্বে ঘর দেওয়ার দাবিতে সপ্তাহকালব্যাপী গ্রামে গ্রামে প্রচার-পথসভার পর ২৯ নভেম্বর বহড়ুতে এসইউসিআই(সি)-র জয়নগর ১ নং ব্লক শাখার উদ্যোগে বিডিও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ মিছিল বিডিও দপ্তরের সামনে এলে সেখানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য তথা উত্তর-দুর্গাপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সবিতা দাস, সভা সঞ্চালনা করেন শিক্ষক কমরেড জয়দেব নস্কর। বক্তব্য রাখেন কমরেডস সুজিত নস্কর, ইলিয়াস মোল্লা, তপতী ভট্টাচার্য, কাশীনাথ সাঁপুই, সুমন্ত গাঙ্গুলী প্রমুখ। বর্তমান টিএমসি জমানায় আগের সিপিএম আমলের মতোই সর্বত্র কীভাবে দুর্নীতি হচ্ছে এবং মানুষ ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই চিত্র বক্তারা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর কেন্দ্রের ও গুজরাটের মতো রাজ্যগুলির বিজেপি পরিচালিত সরকারের ব্যর্থতা, মিথ্যাচার ও সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন। পুলিশ ও সরকারি আধিকারিকরা যে নগ্ন ভাবে সরকারি দলের দাসত্ব করছে তার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন। গ্রামে গ্রামে, গণকমিটি গঠন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

পার্টির বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সহদেব কয়ালের নেতৃত্বে কমরেডস সুশীল মণ্ডল, আনারুল ইসলাম মোল্লা, শান্তি চক্রবর্তী ও শিপ্রা সরকার বিডিও-র সাথে আলোচনায় দাবিগুলির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ প্রদান করলে বিডিও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

এআইইউটিইউসি-র ওড়িশা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভুবনেশ্বরে শ্রমিক সভা। ১৮ ডিসেম্বর

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com